aspbd.com
your application service provider
service@aspbd.com
Bangla Dynamic PDF Creator

সাতকাহন

আমার শিক্ষক, সবার লেখক

২০০৭-১১-০৯ : শিহাব সরকার

১৯৭০-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ফার্স্ট ইয়ার অনার্সে ভর্তি হওয়ার দিন কয়েকের মধ্যে আমরা জেনে যাই—ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ছাত্রদের কাছে ‘সিরাজ স্যার’ বা ‘সিরাজুল ইসলাম স্যার’ নন। তার পরিচয় নামের ইংরেজি বানানের তিনটি আদ্যাক্ষর নিয়ে খুবই সংক্ষিপ্ত এক অ্যাক্রনিম—'ঝওঙ' বা ‘সিক’। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে নিজেদের মধ্যে আমরা স্যারকে উল্লেখ করেছি শুধু ‘সিক’ হিসেবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছি তিন দশকের বেশি সময় হয়ে গেল। ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আমাদের কাছে আজো ‘সিক’।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের শিক্ষকদের মতো ইংরেজি ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকরাও ছিলেন নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে অনন্য। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ শিক্ষক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা ছিলেন গুরুগম্ভীর কণ্ঠের রাশভারি, আসর-জমানো প্রকৃতির মানুষ। তিনি পড়াতেন সুইনবার্ন। ঠিক তার উল্টো ছিলেন মৃদুভাষী আহসানুল হক, পড়াতেন প্রথমে ডিকেন্স, পরে হার্ডির উপন্যাস। মাতৃমমতায় স্নিগ্ধ অথচ কঠোর বা রিজার্ভড এবং নিয়মানুবর্তী হোসনে আরা ম্যাডাম বা তারই কাছাকাছি মেজাজের ইনারি হোসেন ছিলেন অন্তর্লীন প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর নিয়াজ জামানের বিপরীত। রাজিয়া খান ছিলেন কিছুটা খেয়ালি এবং আটপৌরে স্বভাবের। মুনিম স্যার যখন বাঁধভাঙা পাহাড়ি স্রোতের ধরনে আমাদের শেলীর কবিতা পড়াতে থাকতেন, মনে হতো তিনি ক্লাসে বইয়ে দিচ্ছেন ইংরেজ রোমান্টিক কবির ঝড়ো ওয়েস্ট উইন্ড। বরাবর শান্ত-সংহত এবং স্মিতবাক দেখেছি কবীর চৌধুরীকে। টিউটোরিয়াল ক্লাসে উদারভাবে নম্বর দিতেন। ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের ওপর স্নিগ্ধতার কোমল ঝাপটা বুলিয়ে দিতেন আরেক শহীদ শিক্ষক রশীদুল হাসান। তার সরাসরি ছাত্র না হলে উইলিয়াম ব্লেকের কবিতার চিত্ররূপময় মূর্ছনা ও ঘ্রাণের আস্বাদ আদৌ আমি নিতে পারতাম কিনা সন্দেহ।

এসব শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের পাশাপাশি ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ছিলেন শ্যামল-সতেজ উদ্যানে পৃথক এক বৃক্ষের মতো। স্যারের তুলনা কেবল স্যারই। অনার্স এবং এমএ ক্লাসের দীর্ঘ এক সময় ধরে তার ছাত্র ছিলাম। সে ক'টি বছর মূল ক্লাসে এবং টিউটোরিয়ালে স্যারের কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ হয়েছে আমার। তখন মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছি তাকে একজন ছাত্র হিসেবে। ডিপার্টমেন্টে আমার চোখে স্যার ছিলেন অতিশয় মিতবাক, মধুর ধরনের গম্ভীর এবং খাঁটি অর্থে একজন পাংচুয়াল মানুষ। শুরুর বেল বাজার সঙ্গে সঙ্গে স্যার ঢুকতেন ক্লাসে এবং কোনোরকম ভান-ভনিতা ছাড়া লেকচার শুরু করে দিতেন। যতদূর লক্ষ্য করেছি, তার কথার মাঝখানে ছাত্রছাত্রীদের কোনো প্রশ্ন তিনি পছন্দ করতেন না। মনে হয়, এতে তার লেকচারের ব্যাঘাত ঘটত। কারণ, কী শেক্‌স্পীয়রের ‘কিং লিয়ার’, কী কনরাডের ‘হার্ট অব ডার্কনেস’ বা ডিএইচ লরেন্সের ‘সানস অ্যান্ড লাভার্স’—যে নাটক বা উপন্যাসের ওপরই তিনি বলতেন না কেন, লেকচারের সময় তাকে মনে হতো ধ্যানমগ্ন একজন মানুষ। ক্লাস আওয়ারের পুরো সময়টুকু চারপাশ যেন তার কাছে লুপ্ত হয়ে যেত, তিনি ডুবে যেতেন দিনের নির্ধারিত লেখকের ভুবনে। এ যেন চেতনায়-

অবচেতনায় পাঠ্যসূচির লেখক এবং তার রচনা কর্তৃক পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার মতো। জীবনে মোটামুটি অনেক ক্লাস বা ওয়ার্কশপ এবং অ্যাকাডেমিক সভা-সেমিনারের বক্তৃতা শুনেছি। কিন্তু ‘সিক’ স্যারের বাহুল্যবর্জিত, লক্ষ্যভেদী লেকচারের সঙ্গে কোনোটির তুলনা চলে না। ঋজু, টানটান ছিল তার বলার ভঙ্গি, কোনোরকম শব্দ-হাতড়ানো বা ফামলিং থাকত না—ক্লাস শেষের বেল বাজার পর আকস্মিক এক যতিচিহ্ন টেনে তিনি লেকচার শেষ করতেন। এবং মন্ত্রমুগ্ধতার ঘোর থেকে হঠাৎ জেগে উঠতাম আমরা।

বেশ ক'বছর পর আমি যখন স্যারের বাংলা গদ্যের একনিষ্ঠ পাঠক, তখন অবাক হয়ে লক্ষ্য করি তার লেখার ভঙ্গি বা শৈলীও তার বলার ধরনের মতো: নির্মেদ, গতিশীল এবং তির্যক। স্যার ইংরেজি লেখেন কম। কিন্তু বাংলায় লেখালেখিতে তিনি সক্রিয় ষাট দশক থেকে। বাংলাদেশের বাংলা পত্রিকার জগতে একজন সামাজিক-রাজনৈতিক কলামনিস্ট হিসেবে পরিচিতির পাশাপাশি আমরা তাকে দেখে আসছি একজন প্রবন্ধকার হিসেবে। তীব্র সমাজ-সচেতন লেখক তিনি, তবে সাহিত্যকেন্দ্রিক বিষয়ের দিকে স্যারের বিশেষ ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়কে স্যার পর্যালোচনা করেছেন ইতিহাস, সমাজ এবং গণসংশ্লিষ্টতার প্রেক্ষাপট থেকে। কেউ কেউ তাকে মার্কসবাদী লেখক বলে থাকেন। আমার অবশ্য তা মনে হয় না। এ পর্যন্ত প্রকাশিত স্যারের বিভিন্ন চরিত্রের লেখা পড়ে আরো অনেকের সঙ্গে আমার মনে হয়েছে, তিনি কলাকৈবল্যবাদে বিশ্বাসী নন। নিছক শিল্পের জন্য শিল্প নয়, শিল্প মানুষ বা জীবনের জন্য। এর একটি বস্তুগত উপযোগিতা রয়েছে। বামপন্থী, মার্কসবাদী লেখকরা শিল্পের এই বিশেষ সংজ্ঞায় নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন। কিন্তু সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মূলত শিল্পী। হয়তো এজন্যই গোঁড়া বামপন্থী লেখকদের মতো মার্কসীয় তত্ত্বের শৃঙ্খলে পুরোপুরি বন্দি হতে পারেননি তিনি। যদিও তার স্থান-কাল এবং চারপাশের মানুষ সম্পর্কে সজাগ তিনি, এবং আমাদের ছোটবড় বিচ্যুতি, স্ববিরোধিতা এবং শাঠ্যগুলো তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর অবচেতন মনের এক বিশাল অংশ জুড়ে আছে বাঙালির আবহমান ঐতিহ্য এবং তার গৌরবময় অতীত, যা মাঝে মাঝে ধূসর হয়ে পড়েছে শাসকশ্রেণীর নিষ্পেষণ এবং বিভিন্ন ধরনের চক্রান্তের কারণে। বাঙালি বিদ্রোহী নিঃসন্দেহে, যুগে যুগে এ জাতি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু উপমহাদেশের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতো খাঁটি অর্থে ক্ষাত্র বা লড়াকু নয় এ জাতি। তার ধমনীর লোহিত ধারায় বয়ে চলেছে সব-ভাসানো আবেগ এবং ভালোবাসার এক প্রস্রবণ। যে- কঠোরতা একটি সদাবিদ্রোহী জাতির অন্যতম শর্ত, তা এর মেজাজে নেই। কালশত্রুর বিনাশ সে চায়। কিন্তু পরাজয়ের পর শত্রুর বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে সে আবার বিচলিতও হয়ে পড়ে। ক্ষমা ও করুণার অমিয় সুধায় সিক্ত বাঙালি জাতিসত্তার একজন সার্থক উত্তরসূরি হিসেবে স্যার তাই তার মৌলিক চরিত্র ও মেধা-কাঠামোর দিক থেকে প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও পাঠকের সামনে একজন সংবেদনশীল এবং বিশুদ্ধ মানবপ্রেমী লেখক হিসেবে টিকে থাকেন। এ পর্যন্ত তার পঞ্চাশটির মতো প্রবন্ধের বই বেরিয়েছে। এসব বইয়ে তিনি এক দীর্ঘ অন্বেষার অংশ হিসেবে আধুনিক বাঙালি মধ্যবিত্তের মনোগঠন এবং মানসিক বিবর্তনকে বিশ্লেষণ করেছেন। রাষ্ট্র ও জাতির অগ্রযাত্রায় এক বিশাল নিয়ামক শক্তির ভূমিকা পালনকারী এই

aspbd.com
your application
service provider
service@aspbd.com
Bangla Dynamic PDF Creator

সাতকাহন

আমার শিক্ষক, সবার লেখক

শ্রেণীটির নানা ভুলভ্রান্তি এবং কপটতা বরাবর তার আক্রমণের বিষয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বাঙালি মধ্যবিত্তকে তার স্খলনের জন্য চূড়ান্তভাবে অভিযুক্ত করেন না। একজন লেখকের সহজাত ভালোবাসাবোধ এবং মমত্বের প্রবল উচ্ছ্বসনের নীচে চাপা পড়ে যায় মধ্যবিত্তের যাবতীয় ত্রুটি। শেষ পর্যন্ত আমরা দেখি মধ্যবিত্তের কাছে স্যারের অনেক প্রত্যাশা। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী কখনোই নৈরাশ্যবাদী নন। তারই ধারাবাহিকতায় বাঙালির সার্বিক উন্নয়নে মধ্যবিত্তের প্রবল এক ইতিবাচক ভূমিকার ওপর তিনি আস্থা রাখেন। সমাজ এবং শিল্পের প্রতি স্যারের অঙ্গীকার, তার পর্যবেক্ষণ—সর্বোপরি জীবনের প্রতি তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির এক বিশ্বস্ত চিত্র পাওয়া যায় তার বিভিন্ন বইয়ে।
‘সিক’ স্যারকে অধিকাংশ পাঠক জানেন প্রবন্ধকার হিসেবে। সাম্প্রতিককালে, নিয়মিত শিক্ষকতা পেশা থেকে অবসর নেয়ার পর, তিনি পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। নতুন প্রজন্মের পাঠকদের জন্য তার সম্পর্কে একটি অজানা তথ্য, তিনি সাহিত্যজীবনের শুরুতে বেশকিছু অনবদ্য ছোটগল্প লিখেছেন। ‘ভালো মানুষের জগৎ’ নামে তার একটি গল্প সঙ্কলন বেরিয়েছে ১৯৯০ সালে। তিনি ছোটদের জন্যও গদ্য লিখেছেন, এক সময় জড়িত ছিলেন একটি কিশোর নাট্য সংগঠনের সঙ্গে। কয়েক বছর ধরে তিনি নিয়মিত একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করছেন। কিছুদিন আগে বাংলাদেশের এক বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচারিত দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে নাটকের প্রতি তার প্রবল দুর্বলতার কথা বলেছেন তিনি। তার প্রিয় নাট্যকার হেনরিক ইবসেন। অনুবাদ করেছেন ইবসেনের ‘ওয়াইল্ড ডাক’। নাটকের জন্য কাজ করে তার তীব্র এক প্যাশ্‌ন্, এর প্রমাণ আমরা পেয়ে গেছি তিন দশক আগে, স্যারের ক্লাসে। ‘কিং লিয়ার’ পড়াতে গিয়ে তিনি মাঝে মাঝে বার্ধক্যপীড়িত, উদ্‌ভ্রান্ত রাজার ডায়ালগ পড়তেন। এখনো কানে বাজে তার সেই আবেগার্দ্র, অথচ সংযত, সংলাপ পড়ার ভঙ্গি। বহু শিক্ষিত মানুষ জানেন, ‘হ্যামলেট’ শেক্‌স্‌পীয়রের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। স্যার আমাদের ক্লাসে বলেছেন, ইংরেজ নাট্যকারের সবচেয়ে বড় নাট্যকীর্তি ‘কিং লিয়ার’। তার কাছে অনেক কিছু শিখেছি আমি। হাতের কাছে স্যারের বই। দেখি, আমি এখনো তাঁর ছাত্র।

(সমাপ্ত)